# হজ্জ তারবিয়াহ

সিরিজ-১৪



## রাসূল (সঃ) এর মাক্কী জীবন

**এ সেশনে যা অন্তর্ভুক্ত থাকছেঃ**

- ভূমিকা
- হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর আগমন
- যে সময়ের পরিস্থিতি একজন নবী আগমনের আবশ্যকতাকে অনিবার্য্য করে তোলে
- রাসূল (সঃ) এর জন্ম অন্ধকারে আলোর আগমন
- রাসূল (সঃ) এর শৈশব, কৈশর ও যৌবনকাল
- হেরা গুহায় ধ্যানে মগ্ন
- নবুয়ত লাভ
- গোপনে দাওয়াত
- প্রকাশ্যে দাওয়াত
- জুলুম নির্যাতন ও অগ্নি পরীক্ষা
- সামাজিক বয়কট ও শিবে আবু তালেবে বন্দী জীবন
- দুঃখ বেদনার অতি কষ্টের বছর
- তায়েফবাসীদের নিকট ইসলামের দাওয়াত
- মিরাজের ঘটনা
- আকাবার প্রথম শপথ
- আকাবার দ্বিতীয় শপথ
- আকাবার তৃতীয় শপথ
- মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত
- কোবায় অবস্থান
- মদিনায় প্রবেশ

# হজ্জ তারবিয়াহ সিরিজ
## আলোচ্য বিষয়সমূহ

১. হজ্জের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং ইহরাম
২. হজ্জের ঐতিহাসিক পটভূমি ও ইবরাহীম (আ:)
৩. আরাফা, মোজদালিফা ও মিনায় অবস্থান এবং হাজীদের করণীয়
৪. জামারাত (পাথর মারা), কুরবানী করা ও মাথা মুন্ডনের বিধান
৫. হজ্জে মাবরুর এবং হজ্জ পরবর্তী করণীয়
৬. মৌলিক বিশ্বাসঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাগুতকে অস্বীকার, কুফর ও ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি
৭. তাওহীদের ধারণা এবং প্রচলিত শিরক ও বিদাআ'ত সমূহ
৮. কবীরা গুনাহ ও তওবার গুরুত্ব
৯. তাহারাতঃ ওযু, গোসল ও তায়াম্মুম
১০. রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সালাত
১১. স্বনির্ভর জাতি গঠনে যাকাত ও উশরঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
১২. ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা
১৩. সুদ নিষিদ্ধকরণঃ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ
১৪. রাসূল (সঃ) এর মাক্কী জীবন
১৫. রাসূল (সঃ) এর মাদানী জীবন
১৬. সাহাবীদের জীবন থেকে
১৭. ইসলামের পারিবারিক জীবন ও সন্তান প্রতিপালন
১৮. পর্দার ইসলামী বিধান ও পোশাক
১৯. ইসলামে সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য: আমানতদারিতা, সত্যবাদিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, কোমলতা ও ত্যাগ

# রাসুল (স.)-এর মক্কী জীবন

## ভূমিকা

মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানবজাতির হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে এ পৃথিবীতে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবী ও রাসূল প্রেরণের এ ধারাবাহিকতা হযরত আদম (আ.)-এর প্রেরণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের মাধ্যমে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। আর মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন সর্বশেষ নবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দাহ এবং সর্বোত্তম মানব। তিনি গোটা মানবজাতির শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। মহান রব্বুল আ'লামীন মানবজাতির ত্রাণকর্তা, মানবতার বন্ধু, বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে আখ্যা দিয়েছেন রহমাতুল্লিল আ'লামীন হিসেবে। সমস্ত মানবজাতির শান্তি, কল্যাণ, নিরাপত্তা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সকলের জন্য তিনিই একমাত্র অনুকরণীয় ও অনুসরণী আদর্শ। আল কুরআন বলছেন,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

'আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ।'

(সূরা আহযাব: ২১)

তিনি জাহেলিয়াতের ঘোর অন্ধকার থেকে মানবজাতিকে উদ্ধার করে দুনিয়ার মানুষের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যা সকল নবী ও রাসূল এবং আসমানী কিতাব নাযিলের মূল লক্ষ্য ছিল । মহান আল্লাহর ঘোষণা হলো,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ

'আমি যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়েছি প্রামাণ্য দলিলসহ, আর নাযিল করেছি কিতাব এবং ন্যায়ের দন্ড যাতে করে গোটা মানবজাতি ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।'(সূরা হাদীদ : ২৫)

পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাই যে, রাসূল (সা.) তাঁর নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সর্বকালের ও সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ও সমাজ

ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন যার পিছনে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে যারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন তাঁরা ছিল তাঁরই হাতে গড়া একদল ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্রের অধিকারী মানুষ। আর এ কাজটির বেশির ভাগ সম্পন্ন করেছিলেন অহিপ্রাপ্তির পর থেকে দীর্ঘ ১৩ বছর মক্কার চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। ঐ সময় তিনি যে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তার ধারাবাহিকতা যাতে কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এ জন্য তিনি তাঁর উম্মতের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন। শেষ নবীর উম্মত হিসেবে এ দায়িত্ব পালন করতে হলে আল্লাহর কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে রাসূলের সীরাতের উপর ব্যাপক অধ্যয়ন করতে হবে। তাঁর এ সীরাতকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হলে তাকে অবশ্যই দ্বীন প্রতিষ্ঠার বাস্তব কাজে অংশ গ্রহণ করতে হবে এবং রিসালাতের দায়িত্ব পালনে পর্যায়ক্রমিক কার্যক্রম ও পদক্ষেপসমুহ গভীর ও নিবিড় মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন ও অনুধাবন করতে হবে।

আবার দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত ও সুন্নত তরিকা কোনটি সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে হলে অহিপ্রাপ্তির দিন থেকে রাসূল (সা.)-এর প্রতি আল্লাহর নির্দেশনার পর্যায়ক্রমিক ধারবাহিকতা এবং রাসূল (সা.)-এর গৃহীত কর্মনীতি ও কর্মকৌশল সম্পর্কে যথার্থ ধারণা লাভ করতে হবে। আর এটা অর্জন করতে হলে কুরআন নাযিলের ধারাবাহিকতা সহকারে তা অধ্যয়ন এবং মাক্কী ও মাদানী অধ্যায়ের বাস্তবতা জনিত পার্থক্যের মৌলিক জ্ঞান লাভ করা একান্ত অপরিহার্য।

কুরআনের গবেষকগণ রাসূল (সা.)-এর নবুওয়াতী জীবনকে মাক্কী ও মাদানী এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। অহিপ্রাপ্তির পর থেকে রাসূল (সা.) দীর্ঘ ২৩ বছর তাঁর দায়িত্ব পালন শেষে মহান মালিকের কাছে চলে যান। সেই ২৩ বছরের ১৩ বছর কেটেছে মক্কায় আর ১০ বছর মদিনায়। মক্কায় ১৩ বছরের এই অধ্যয়টিকে রাসূলের মাক্কী জীবন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ অধ্যয়টি ব্যক্তিগঠন এবং

সংগ্রামের যুগ হিসেবে অভিহিত। রাসূল (সা.)-এর মাক্কী জীবনের কার্যক্রমকে চারটি পর্যায় ভাগ করা হয়েছে।

**হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন**

হযরত ঈসা (আ.)-এরপর প্রায় পাঁচশত বছর যখন অতিক্রান্ত হয়েছে, সমগ্র পৃথিবীর মানুষ যখন নবীর শিক্ষা ও আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে শিরক, কুফুর, অন্যায় জুলুমে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বশেষ নবী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ পৃথিবীতে আগমন করেন। তাঁর মাধ্যমে গোটা মানবজাতি সর্বশেষ ঐশিগ্রন্থ, অতীতের সকল আসমানী কিতাবে স্মরক গ্রন্থ হিসেবে আল কুরআনের নেয়ামত লাভ করেন।

সে সময়ের পরিস্থিতি একজন নবী আগমনের আবশ্যকতাকে অনিবার্য করে তোলে ঐ সময়টিকে ঐতিহাসিকগণ অন্ধকার যুগ বলে আখ্যায়িত করেছেন। মুর্তিপুজা গোটা জাতির অন্তরে আসন গেড়ে বসেছিল। এমনকি কাবা গৃহে ৩৬০টি মুর্তি স্থান পেয়েছিল। মক্কার ঘরে ঘরে, হাটে-বাজারে, গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে মুর্তি স্থাপন করা হয়। লোকেরা সেগুলো পুজা করতো।

এদের নামে তারা মানত করত ও কুরবানী দিতো। চরিত্রহীনতা, অশ্লীলতা-বেহায়াপনা, হিংসা-বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, জুলুম-শোষণ, খুন-খারাবী, স্বেচ্ছাচারিতা, ধনী-দরিদ্রের সীমাহীন বৈষম্য, মানুষকে পশুর ন্যায় হাটে-বাজারে বিক্রি করা, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত হত্যা করা, নারী জাতিকে মানুষের কাতারে গণ্য না করাসহ নানাবিধ ঘৃণিত, হীন ও নিকৃষ্ট কর্মকান্ডের মধ্য দিয়েই তারা জীবন অতিবাহিত করতো। নির্লজ্জ আচরণে তারা এতদুর পর্যন্ত পৌঁছেছিল যে, পুরুষ ও নারী একত্রে উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘর তাওয়াফ করাকে ধর্মীয় কাজ মনে করতো। মোটকথা, ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে তখনকার আরব ভূমি অধ:পতনের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল।

## রাসূল (সা.)-এর জন্ম অন্ধাকারে আলোর আগমন

'আমুল ফিল' অর্থাৎ হস্তীবাহিনী নিয়ে আবরাহার কাবা অভিযানের ঘটনা যে বছর ঘটে, সেই বছরের রবিউল আউয়াল মাসের দ্বাদশ রজনী অতিক্রান্ত হবার শুভ মুহুর্তে সোমবার, রাসূল (সা.) জন্ম গ্রহণ করেন।

হাসসান ইবনে সাবিত (রা.) বলেন, 'আমি তখন সাত আট বছরের বালক হলেও বেশ শক্তিশালী ও লম্বা হয়ে উঠেছি। যা শুনতাম তা বুঝতে পারার ক্ষমতা তখন হয়েছে। হঠাৎ শুনতে পেলাম জনৈক ইহুদী ইয়াসরিবের (মদিনার) একটা দুর্গের উপর দাড়িয়ে উচ্চস্বরে 'ওহে ইহুদী সমাজ'! বলে চিৎকার করে উঠলো। লোকেরা তার চারপাশে জমায়েত হয়ে বললো, 'তোমার কি হয়েছে? সে বললো, 'আজ রাতে আহমদের জন্মের সেই নক্ষত্র উদিত হয়েছে।'

সর্বাধিক প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে, আইয়্যামে জাহেলিয়াতের অন্ধকার দূর করে তাওহীদের সুমহান বাণী নিয়ে আরবের মরুর বুকে ৫৭০ খ্রিঃ রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে সোমবার সুবহে সাদিকের সময় মক্কার হাশেম নামক প্রসিদ্ধ জায়গায় মা আমিনার কোল জুড়ে সমগ্র বিশ্ব মানবতার মহান মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (সা.) জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মের পর পরই তাঁর নাম রাখা হয় মুহাম্মদ।

১২ রবিউল আউয়াল সোমবার রাসূল (সা.)-এর জন্মদিন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিবস হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। কেননা সোমবারের দিনে তিনি নবুওয়াত লাভ করেন। এই দিনে তিনি মক্কা থেকে মদিনায় হিযরত করেন এবং এই সোমবারে তিনি মদীনায় পৌঁছেন। আবার সোমবারের দিনে তিনি বায়তুল্লায় হাজারে আসওয়াদ স্থাপন করেন এবং সোমবারেই তিনি মিরা'জে গমন করেন। সর্বশেষ সোমবারের দিন তিনি ইহজগত থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

## বংশ পরিচয়

তাঁর পিতা ছিলেন কুরাইশ সরদার আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র আব্দুল্লাহ। যিনি খুবই প্রশংসনীয় গুণাবলী ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর মাতা ছিলেন বনু যুহরার সর্দার ওহাবের কন্যা আমিনা।

## রাসূল (সা.)-এর শৈশব কৈশর ও যৌবনকাল

জন্মের পরে স্নেহময়ী মা আমিনা তাঁকে সর্বপ্রথম দুধ পান করান। দুই, তিন পর্যন্ত চাচা আবু তালেবের বাঁদী 'সাওরিয়া'ও রাসূল (সা.)-কে স্তন্য দান করেন। এরপর আববের প্রথা অনুযায়ী হযরত হালিমাতুস সাদিয়া (রা.) রাসূল (সা.)-এর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাসূল (সা.)-এর বয়স যখন ছয় বছর তখন হযরত মা আমিনা তাঁকে নিয়ে স্বামীর কবর যিয়ারত ও আত্মীয় স্বজনদের সাথে পরিচয় করানোর জন্য মদিনায় প্রায় এক মাস অবস্থান করেন। কিন্তু কিন্তু মদিনা থেকে ফেরার পথে 'আরওয়া' নামক স্থানে মা আমিনা ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

মায়ের ইন্তিকালের পর রাসূল (সা.)-এর লালন-পালন ও দেখা শোনার দায়িত্ব দাদা আব্দুল মুত্তালিবের উপর অর্পিত হয়। তিনি সব সময় তাঁকে সাথে সাথে রাখতেন। রাসূল (সা.)-এর বয়স যখন আট বছর তখন দাদা আব্দুল মুত্তালিবও মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় রাসূল (সা.)-এর লালন-পালনের ভার পুত্র আবু তালিবের উপর অর্পন করেন। তিনি এ মহান দায়িত্ব কর্তব্য অতি সুষ্ঠভাবে পালন করে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আবু তালেব ছিলেন রাসূল (সা.)-এর আপন চাচা। এ জন্য তিনি নিজের ঔরশজাত সন্তানের চেয়েও তাঁকে বেশি আদর যত্ন করতেন।

তাঁর যৌবনের প্রথম দিকে অনেক কষ্টে জীবন অতিবাহিত হলেও তিনি ছিলেন সফল ব্যক্তিত্বের চুড়ান্ত দৃষ্টান্ত। তৎকালিন জাহেলী সমাজের মধ্য থেকেও তিনি ছিলেন সৎ,মার্জিত, বিনম্র চরিত্রের অধিকারী। ব্যক্তি জীবনে ছিলেন অত্যন্ত

সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, বিনয়ী, নিরহঙ্কার, বিবাদ মিমাংশাকারী এবং কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তাঁর সত্যবাদী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে আরববাসীরা তাঁকে আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত করেন।

তাঁর বয়স আরো বেড়ে যায়, তখন জীবিকা নির্বাহের জন্য বকরি চরানোর পেশা গ্রহণ করেন। এর আগেও বনী সা'দ গোত্রে দুধ ভাইয়ের সাথে বকরি চরিয়েছেন। [সহীহ বুখারী]

যখন তিনি পঁচিশ বছর বয়সে উপনীত হলেন তখন কুরাইশ বংশের প্রভাবশালী মহিলা হযরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রা.)-এর সাথে উভয় পরিবারের স্বত:স্ফুর্ত সম্মতি ও আনন্দঘন পরিবেশে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আবু তালিব এ বিয়ের খুতবা পাঠ করেন। হযরত খাদিজা (রা.) একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। বিয়ের পর রাসূল (সা.)-এর সত্যবাদীতা, উত্তম আখলাক, আমানতদারী তিনি অতি নিকট থেকে লক্ষ্য করেন। তাই পরবর্তীতে নিজের ব্যবসার যাবতীয় দায়িত্বভার রাসূল (সা.)-এর উপর অর্পণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর ব্যবসায় অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়।

রাসূল (সা.)-এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর মক্কার কুরাইশরা নতুনভাবে কা'বা ঘর নির্মাণের উদ্যেগ গ্রহণ করেন। এক পর্যায়ে 'হাজরে আসাদ' পাথরটি স্থাপন নিয়ে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। এ সময় রাসূল (সা.) সকল গোত্রকে সাথে এবং সকলের মতামতের ভিত্তিতে নিজ হাতে উঠিয়ে 'হাজরে আসওয়াদ' পাথরটি যথাস্থানে বসিয়ে দিলেন। এরপর বাকী ইমারত নির্মিত হয়। এ ধরনের ফয়সালার মাধ্যমে রাসূল (সা.) কুরাইশদের মধ্যকার এক বিরাট রক্তপাতের হাত থেকে সবাইকে রক্ষা করেন।

আরবদের মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহের ধারা বর্তমান ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কার ছিল ফুজ্জারের যুদ্ধ। এ যুদ্ধের পর কিছু সচেতন কল্যাণকামী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে রাসূল (সা.) 'হিলফুল ফুজুল' নামে একটি শান্তি সংঘ গড়ে তোলেন। এ সংস্থা তাদের নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

**হেরাগুহায় ধ্যানে মগ্ন**

মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে জাবানুন নূর-এ 'হেরা' নামে একটি পর্বত-গুহা ছিল। তিনি প্রায় সেখানে অবস্থান করে নিবিষ্ট মনে চিন্তা-ভাবনা ও আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। আর খানাপিনার দ্রব্যাদি সাথে নিয়ে যেতেন। খাবার শেষ হয়ে গেলে আবার খাবার নিয়ে আসতেন। অনেক সময় হযরত খাদিজা (রা.)ও তাঁকে খাওয়ার পৌঁছে দিতেন।

## নবুওয়াত লাভ (৬১০ খ্রিঃ)

রাসূল (সা.)-এর বয়স যখন চল্লিশ বছর পূর্ণ হলো এ সময়ের দিনগুলোতে আল্লাহর নবীর একাকিত্ব ও নির্জনে থাকাটা তাঁর নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়। তিনি সকলের থেকে আলাদা হয়ে নিংসঙ্গ অবস্থানে অনেক তৃপ্তি পেতেন, শান্তি পেতেন। হযরত উবাইদ ইবনে উমাইর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা.) প্রতি বছর এক মাস হেরা গুহায় নির্জনে ইবাদতে কাটাতেন। এক মাসের এ নির্জনবাস সমাপ্ত করে রাসূল (সা.) নিজের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার আগে সর্বপ্রথম কা'বায় প্রবেশ করে সাত বা ততোধিক বার তাওয়াফ করতেন এবং এ কাজ করেই তারপর বাড়িতে ফিরতেন।

অতপর আল্লাহ কর্তৃক তাঁকে পরম সম্মানে ভূষিত করার সেই রমজান মাস সমাগত হলে রাসূল (সা.) যথারীতি হেরা গুহায় অবস্থানের জন্য রওনা হলেন। অবশেষে সেই মহান রাতটি এলো, যে রাতে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে রেসালাত দিয়ে গৌরবান্বিত করলেন। এই সময় আল্লাহর নির্দেশে জিব্রাঈল (আ.) তাঁর কা ‡ ছ আসলেন। রাসূল (সা.) বলেন, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এই অবস্থায় জিব্রাঈল (আ.) একখন্ড রেশমী কাপড় নিয়ে আবির্ভুত হলেন। ঐ রেশমী কাপড় খন্ডে কিছু লেখা ছিল। জিব্রাঈল (আ.) আমকে বললেন, 'পড়ুন! আমি বললাম 'আমি পড়তে পারি না।' তখন তিনি আমাকে এমন জোরে আলিঙ্গন করলেন যে, আমি ভাবলাম, মরে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন! আমি বললাম 'আমি পড়তে পারি না। তিনি পূনরায় আমাকে সজোরে আলিঙ্গন

করলেন। এবার চাপের প্রচন্ডতায় আমার মৃত্যুর আশংকা হলো। আবার তিনি ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, 'পড়ুন! আমি বললাম 'আমি কি পড়বো'?

রাসূল (স:) বললেন,

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ- خَلَقَ ٱلإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ- ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلأَكْرَمُ- ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ- عَلَّمَ ٱلإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

'পড়ুন আপনার সেই প্রভূর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়ুন, আর আপনার প্রভূ অতিশয় মহিমান্বিত। তিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে সেইসব জিনিস শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না।'

(সূরা আলাক:১-৫)

রাসূল (সা.) বলেন, অতপর আমি শোনানো আয়াত কটি পড়লাম। এই পর্যন্ত পড়িয়ে জিব্রাঈল থামলেন, অতপর চলে গেলেন। এরপর আমি ঘুম থেকে উঠলাম। মনে হলো যেন আমার মানসপটে কিছু লিখে নিয়েছি। এরপর আমি হেরা গুহা থেকে বেরিয়ে এলাম। পরবতের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলে হঠাৎ উপর থেকে আওয়াজ শুনতে পেলাম 'হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি জিব্রাঈল।' এটাই হলো অহি নাযিলের ঘটনা। এরপর রাসূল (সা.) ঘরে ফিরে এলেন। তাঁর বুক ধুক ধুক করছিল। স্ত্রী খাদিজা বিনতে খোয়াইলিদ (রা.)-কে বললেন আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। বিবি খাদিজা (রা.) রাসূল (সা.)-কে চাদর দিয়ে জড়িয়ে শুইয়ে দিলেন। তাঁর ভয় কেটে গেল। এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) হলেন,

**عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -- فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ-**

উম্মুল মু'মিনিন আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, (অত:পর তিনি রাসূল (সা.) এর উপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার প্রারম্ভিক ঘটনা বর্ণনা করেন)। অত:পর রাসূল (সা.)

খাজিদা (রা.)-কে সম্বোধন করে হেরা গুহায় ঘটে যাওয়া ঘটনা অবহিত করে বললেন : আমি আমার প্রাণ নাশের আশংকা করছি। জবাবে খাদিজা (রা.) বললেন : কখনো নয়, আল্লাহর কসম। আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অন্যের বোঝা বহন করেন, নিঃস্ব অসহায় মানুষের জন্য উপার্জন করে দেন, আপনি মেহমানদারী করেন এবং ন্যায় যখন বিপদগ্রস্থ হয় আপনি তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। (সহীহ বুখারী)

অরপর হযরত খাদিজা (রা.) রাসূল (সা.)-কে তাঁরই চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নওফেলের নিকট নিয়ে গেলেন। রাসূল (সা.) হিরা গুহায় যা যা দেখেছেন সব তাকে বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন। সব শুনে ওয়ারাকা বললেন, নিশ্চিত জেনো, তুমি এ যুগের মানব জাতির নবী। সেই মহাদূতই তোমার কাছে এসেছিলেন যিনি মুসা (আ.)-এর কাছেও আসতেন। তুমি এটাও নিশ্চিত জেনে রেখো যে, তোমার বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হবে, নির্যাতন করা হবে। তোমাকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে এবং তোমার বিরুদ্ধে লড়াই করা হবে। আমি যদি তখন জীবিত থাকি তাহলে অবশ্যই আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় তোমাকে প্রকাশ্যভা ‡ ব সাহায্য করবো।'

এরপর কিছুদিন ওহী নাযিল স্থাগিত থাকে। এ সময়ে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলকে মানসিক প্রস্তুতির জন্য সময় দেন। সূরা আলাকের প্রথম আয়াত কটিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে যে রাসূল হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে তার ইঙ্গিত এসেছে। হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, ওহী কিছুদিন স্থগিত থাকে এর কারণ ছিলো এই যে, তিনি যে ভয় পেয়েছিলেন সেই ভয় যেন কেটে যায় এবং পূণরায় প্রাপ্তির আগ্রহ এবং প্রতিক্ষা যেন তাঁর মনে জাগে।'

হাদীসে এসেছে হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, তিনি

প্রিয় নবীর মুখে ওহী স্থাগিত হওয়ার বিবরণ শুনেছেন। রাসূল (সা.) বলেছেন, আমি পথ চলছিলাম, হঠাৎ আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শোনা গেল। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি সেই ফেরেশতা যিনি হেরা গুহায় আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি আসমান ও জমিনের মাঝখানে একখানি ঝুলন্ত চেয়ারে বসে আছেন। আমি ভয় পেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। এরপর বাড়িতে এসে আমার স্ত্রীর কাছে বললাম, আমাকে কোম্বল জড়িয়ে দাও, আমাকে কোম্বল জড়িয়ে দাও। স্ত্রী আমাকে কোম্বল জড়িয়ে শুইয়ে দিলেন। এরপর আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে সূরা মুদ্দাসিরের কয়েকটি আয়াত নাযিল হয় এবং তাতে তাঁর রাসূল হিসেবে প্রধান দায়িত্ব যে, তাওহীদের বিপ্লবী দাওয়াত এবং মিথ্যা ইলাহ দাবিদারদের শিকড় মানুষের মন ও সমাজ থেকে উপড়ে ফেলা তা বলে দেয়া হয়েছে। এরও কিছুদিন পর সূরা মুজাম্মিলের প্রথম দিকে রেসালাতের উর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনী যোগ্যতা অর্জনের পন্থা কি কি হতে পারে তা বলে দেয়া হয় এবং পরবর্তী মক্কী সূরা সমুহের আলোচ্য বিষয়সমুহ সে আত্মপ্রস্তুতিরই প্রতিধবনি মাত্র। [তাফহীমুল কুরআন]

## গোপনে দাওয়াত (৬১০-৬১৩ খ্রিঃ তিন বছর)

আল কুরআনের নির্দেশনার আলোকে রাসূল (সা.) দাওয়াত ও আন্দোলনের কাজে মনোযোগী হলেন। এ কাজের সূচনাতেই বাঁধা আসতে থাকে। তবে ব্যাপক দাওয়াত না হয়ে সীমিত পরিসরে হওয়ার কারণে বাধার ধরন ছিলো মৌখিক গালমন্দ, ঠাট্টা-মসকারা, অপবাদ অপপ্রচারের মধ্যে সীমিত। এ সময় হযরত খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূল (সা.)-এর আন্দোলনের সহযোগি হিসেবে শক্ত ভূমিকা রাখতে থাকেন। তিনি শুধু ইসলাম গ্রহণ করেননি, বরং রাসূলের রেসালতের দায়িত্ব পালন করার জন্য নিজের গোটা অর্থ সম্পদ তাঁর কাছে সোপর্দ করেছিলেন। বিরোধীদের কষ্ট লাঘবে তিনি সান্তনা ও সাহস যোগাতেন।

রাসূল (সা.) এবং হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইবাদত বন্দেগী সালাত আদায় ও পবিত্র কুরআনের আয়াত শুনে দশ বছরের কিশোর হযরত আলী (রা.) ইসলাম কবুল করেন। হযরত আবু বকর (রা.) বিশ্বস্ত ও গুণমুগ্ধ বন্ধু হিসেবে রাসূলের প্রতি ঈমান আনলেন।

ঈমান আনার পর হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর অবস্থান ও প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে নিজের পরিচিত জনদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারে আত্ম নিয়োগ করেন। মূলত: মুহাম্মদ (সা.)-এর রেসালাতের কঠিন এ দায়িত্ব পালনের কাফেলার প্রাথমিক সাথী এ চারজন মানুষ। সংখ্যার বিচারে নিতান্তই নগন্য। কিন্তু গুণগত ও মানগত বিচারে তারা সকলেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। রাসূল (সা.)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত দ্বীন কায়েমের আন্দোলের বুনিয়াদ গঠনে এদের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম স্তরের এই তিন বছরে নীরবে তৎপরতার বাইরে তেমন কার্যক্রম না থাকায় কাফের ও মুশরিকদের পক্ষ থেকে অবজ্ঞা প্রদর্শন ছাড়া তেমন বড় রকমের বিরোধীতা দেখা যায়নি।

## প্রকাশ্য দাওয়াত (৬১৪-৬১৫ খ্রি: দুই বছর)

নবুয়াতের তিন বছর পর প্রকাশ্যভাবে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। আল কুরআন বলছে, فَٱصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡمُشۡرِكِينَ 'অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছো তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদের উপেক্ষা করে চলুন।'[সূরা হিজর : ৯৪] অন্য আরো একটি আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে,

وَ أَنذِرۡ عَشِيرَتَكَ ٱلۡأَقۡرَبِينَ-وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِين

তোমার নিকটআত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও, আর যারা তোমার অনুসরণ করে সেই সমস্ত মু'মিনদের প্রতি বিনয়ী হও।'[সূরা হিজর : ২১৪-২১৫]

এ নির্দেশ প্রাপ্তির পর রাসূল (সা.) সাফা পাহাড়ে উঠে মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে সজোরে ডাক দিলেন ইয়া সাবাহা..বলে। এ আওয়াজ যে মুহাম্মদ (সা.)-এর, এ

কথা বুঝতে পেরে সকল গোত্রের লোকেরা পাহাড়ের পাদদেশে এসে সমবেত হলেন। এদের মাঝে তাঁর চাচা আবু লাহাবেরও আগমন ঘটে। এ সময় রাসূল (সা.) উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, 'হে লোকসকল! আমি যদি বলি যে, এ পাহাড়ের পিছনে বিরাট একদল শত্রু সৈন্য তোমাদের উপরে আক্রমণের উদ্দেশ্যে ওঁৎ পেতে রয়েছে। তবে কি তোমরা তা বিশ্বাস করবে? জবাবে লোকেরা বলে, 'নিশ্চয় বিশ্বাস করবো। তুমিতো কখনো মিথ্যা বলোনি। আমরা তোমাকে আল-আমীন, আস-সাদিক বলেই জানি।'

রাসূল (সা.) বললেন, তাহলে শোন! আমি তোমাদেরকে এক স্রষ্টার বন্দেগীর দিকে আহবান জানাচ্ছি এবং মুর্তিপুজার অশুভ পরিণতি থেকে তোমাদেরকে বাঁচাতে চেয়েছি। তোমরা আমার কথা না শুনলে আমি তোমাদেরকে এক কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি।' এ কথা শুনেই আবু লাহাব ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলো, 'তবে কি তুমি এটুকু কথা বলার জন্যই আমাদেরকে এ সকালে ডেকে নিয়ে এসেছে।'[ইবনে কাসির] আবু লাহাবের এ কথা বলার পর আল্লাহ তা'য়ালা সুরা লাহাব নাযিল করেন। এতে বলা হয় আবু লাহাবের দু'টি হাত ধবংস হোক এবং সে নিজেও ধবংস হোক।'

এর কয়েকদিন পর রাসূল (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে একটি দাওয়াত সভার আয়োজন করতে বলেন। তাতে সপরিবারে আব্দুল মোত্তালিব খান্দানকে আমন্ত্রণ করা হয়। এ দাওয়াতে হযরত হামজা (রা.), আবু তালেব, আব্বাস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। পানাহার শেষে রাসূল (সা.) দাড়িয়ে বললেন : 'আমি এমন এক জিনিস নিয়ে এসেছি, যা দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের জন্য যথেষ্ট। এ বিরাট বোঝা বহনে কে আমার সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছেন? এভাবে দাওয়াতের প্রকাশ্য তৎপরতা চলতে থাকে। এ সময় রাসূল (সা.) পৌত্তলিকতার নোংরামী ও অকল্যাণসমুহ প্রকাশ্যে তুলে ধরেন এবং মিথ্যার পর্দা উন্মোচিত করেন। তিনি মুর্তিসমুহের অন্তসারশুনতা, মূল্যহীনতা তুলে ধরেন এবং তাদের

স্বরূপ উদঘাটন করেন। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে দিয়ে বুঝাতে থাকেন যে, মুর্তিসমুহ নিরর্থক ও শক্তিহীন। তিনি আরো জানান যে, যারা এসব মুর্তিপুজা করে এবং নিজের ও আল্লাহর মধ্যে এদেরকে মাধ্যম হিসেবে স্থির করে তারা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে।

এ কথা শোনার পর মক্কার অধিবাসীরা ক্রোধে দিশেহারা হয়ে পড়লো। তারা কোমড় বেঁধে উঠে দাড়ালো। কারণ তারা জানতো যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মা'বুদ হিসেবে অস্বীকার করা এবং রেসালাত ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ হচ্ছে নিজকে পরিপূর্ণভাবে তাঁর কাছে ন্যস্ত করা এবং তাঁর কা ‡ ছ নি:শর্তভাবে আত্মসমার্পণ। রাসূল (সা.) ও তাঁর সঙ্গী সাথীদের দ্বীনের পথে এ ধরনের আপোষহীন ও অনমোনীয় মনোভাব দেখে কুরাইশ নেতারা রাসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীদেরকে লেলিয়ে দেয়। তারা প্রিয় নবীকে নানাভাবে কষ্ট ও যন্ত্রণা দিতে শুরু করে। তারা তাকে মিথ্যাবাদী, গনক, যাদুকর, কবি, পাগল ইত্যাদি বলে অপদস্থ করতে থাকে। কিন্তু রাসূল (সা.) দ্বীনের দাওয়াত অব্যাহত রাখেন। ফলে কুরাইশ নেতারা অনেক চিন্তা ভাবনার পর এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, তারা রাসূল (সা.)-এর চাচা আবু তালেবের কাছে যাবে এবং তাকে অনুরোধ করবে, তিনি যেন নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে তাঁর কাজ থেকে বিরত রাখেন।

তারা যথারীথি কয়েকজন কুরাইশ নেতা আবু তালেবের নিকট গেল এবং বললো হে আবু তালেব, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের উপাস্যদের গালাগাল করছে, আমাদের দ্বীনকে পথভ্রষ্টতা বলছে এবং আমাদের বিবেককে নির্বুদ্ধিতা বলে অভিহিত করছে। আমাদদের পিতা ও পিতামহদেরকে পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করছে। কাজেই হয়তো আপনি তাকে বাধা দিন অথবা তাঁর এবং আমাদের মাঝখান থেকে আপনি সড়ে দাঁড়ান।

আবু তালেব রাসূল (সা.)-কে কুরাইশ নেতাদের এ ধরনের মনোভাবের কথা

জানালে রাসূল (সা.) আবু তালেবকে স্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'চাচা! আল্লাহর কসম করে বলছি! তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্ব ও বাম হাতে চাঁদ এনে দেয় এবং তার বিনিময়ে আমাকে এ কাজ ত্যাগ করতে বলে, তবু আমি এটা ত্যাগ করবো না। আমি ততদিন পর্যন্ত এ কাজ করতে থাকবো, যতদিন না আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করেন কিংবা এই কাজ করতে করতে আমি ধবংস হয়ে যাই।' এ কথা বলার পর রাসূল (সা.)-এর দু' চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। অতপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং চলে যেতে উদ্যত হলেন। কিছুদূর অগ্রসর হলে আবু তা ‡ লব তাকে ডেকে বললেন, 'ভাতিজা কাছে এসো।' তিনি কাছে গেলেন। আবু তালেব বললেন,'ভাতিজা ঠিক আছে! তুমি যা বলতে চাও বলতে থাকো। আমি কখনো কোন কারণে তোমাকে ওদের কাছে সমার্পণ করবো না।' [ইবনে হিশাম]

## জুলুম নির্যাতন ও অগ্নি পরীক্ষা [৬১৬-৬২০ খ্রিঃ পাঁচ বছর]

নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে একদিকে যেমন জুলুম নির্যাতন বেড়ে গেল অন্য দিকে মুসলমানদের সংখ্যাও বাড়তে থাকলো। ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে ব্যাপক কৌতুহল সৃষ্টি হলো। কুরআনের আওয়াজ সর্বত্র ধবনিত ও প্রতিধবনিত হচ্ছিল। এ আন্দোলন মক্কা ও কুরাইশদের অবস্থান অতিক্রম করে বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এসব প্রেক্ষাপটে ইসলামী আন্দোলন ও পুরনো জাহেলিয়াতের এক কঠিন দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয়। ইসলাম বিরোধীরা সর্বশক্তি নিয়ে ইসলামের ভিতকে নিশ্চিহ্নের জন্য নও-মুসলিমদের উপর অমানষিক জুলুম-নির্যাতন চালায় এবং তাদেরকে সর্বতোভাবে ধবংস করার জন্য সংঘবদ্ধ হয়। তাছাড়া কুরাইশদের এ পর্যায়ের জুলুম নিপীড়নের ঘটনা অত্যন্ত নির্মম ও হৃদয়বিদারক ছিলো। যেমন :

### খাব্বাব ইবনে আরাত (রা.)

ইনি ছিলেন উম্মে আম্মারের গোলাম। প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে তিনি কুরাইশদের নির্মম জুলুমের

শিকার হন। একদিন কুরাইশরা মাটির উপর কয়লা জ্বালিয়ে তার উপর খাব্বাব (রা.)-কে চিৎ করে শুইয়ে দেয় এবং একজন তাকে পা দিয়ে সজোরে চেপে ধরে রাখে যাতে সে নড়াচড়া করতে না পারে। এতে তার শরীরের চর্বি গলে পিঠের নিচের জ্বলন্ত কয়লা নিভে যায়।

## হযরত বিলালা (রা.)

তিনি ছিলেন উমাইয়া বিন খালফের গোলাম। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে উমাইয়া তাঁকে দুপুরের উত্তাপ্ত বালুকার উপর শুইয়ে দিয়ে বুকের উপর ভারী পাথর দিয়ে রাখার নির্দেশ দিত। তারপর তাকে বলতো, 'মুহাম্মদকে অস্বীকার করে লাত ও ইয্যার পুজা করতে রাজি না হলে আমৃত্যু এ ভাবে থাকতে হবে। এহেন যন্ত্রণা ভোগের মুহূর্তেও তিনি বলতেন আহাদ, আহাদ অর্থাৎ আল্লাহ এক, আল্লাহ এক।

## হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা.)

তিনি ছিলেন ইয়ামেনের অধিবাসী। প্রথম দিকে যে ক'জন সাহসী ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন তারমধ্যে আম্মার ছিলেন অন্যতম। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে কুরাইশরা তাঁকে এবং তাঁর পিতামাতাকে উত্তপ্ত দুপুরের সময় মক্কার উতপ্ত মরুভূমিতে শুইয়ে এতো প্রহার করতো যে, তারা জ্ঞান হারা হয়ে যেতেন। তারা গোটা পরিবার ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের উপর নির্যাতন চলাকালে রাসূল (সা.) তাঁদের কাছে উপস্থিত হতেন এবং সান্তনা দিয়ে বলতেন, হে ইয়াসারের পরিবার, ধৈর্যধারণ করো। তোমাদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।' আম্মারের মাতা হযরত সুমাইয়া (রা.)-কে তারা মারতে মারতে মেরেই ফেললো। তথাপিও ইসলাম ত্যাগ করেননি।

## হযরত লুবাইনিয়া (রা.)

তিনি ছিলেন একজন বাঁদী। মুসলমান হওয়ার পূর্বে হযরত উমার (রা.) তাঁকে এতোই মারধোর করতেন যে, তিনি নিজেই ক্লান্ত হয়ে যেতেন। কিন্তু এ আল্লাহভক্ত মহিলা শুধু বলতেন, 'তুমি ইসলাম গ্রহণ না করলে আল্লাহ তোমার কাছ থেকে এর বদলা গ্রহণ করবেন।'

## হাবশা বা আবিসিনিয়ায় হিযরত

পরিস্থিতি এমন হয়েছিলো যে, মানবিক দৃষ্টিতে তা সহ্যের সীমা অতিক্রম করার উপক্রম হলো, তখন রাসূল (সা.) তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে আবিসিনিয়ায় হিযরতের নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, 'তোমরা যদি মক্কা ভূমি ত্যাগ করে হাবাশায় চলে যেতে পারো তবে তোমাদের ভালো হবে। কেননা সেখানে এমন একজন বাদশাহ আছেন যার ওখানে কারো উপর জুলুম করতে দেয়া হয় না। ঐ দেশটি ভালো। তোমাদের বর্তমান বিপদ মুসিবত আল্লাহর পক্ষ থেকে দূর না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সেখানেই অবস্থান করবে।

রাসূলের এই নির্দেশক্রমে প্রথমে এগারো জন পুরুষ ও চার জন মহিলা হাবশায় চলে যান। পরবর্তী পর্যায়ে আরো কিছু সংখ্যক নারী-পুরুষ আবিসিনিয়ায় পৌঁছে যায় এবং সেখানে সকলে একত্রিত হয়। তাদের মোট সংখ্যা হলো একশত এক জন। এর মধ্যে কুরাইশ গোত্রের বিভিন্ন শাখায় ৯৪ জন এবং কুরাইশ গোত্রের বাইরের ৭ জন ছিলেন। রাসূল (সা.)-এর সাথে যারা মক্কায় রয়ে গেলেন তাদের সংখ্যা মোট ৪০ জন। রাসূলের মাজলুম সাহাবীদের এই হিযরতের ঘটনায় কুরাইশদের মধ্যে সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। কেননা কুরাইশদের ছোট বড় প্রায় পরিবার থেকে কেউ না কেউ এই হিযরতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে কারো বিরোধীতা আরো তীব্র হয় আবার কারো মনে ইসলামের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পায় যার কারণে অনেকে ইসলাম কবুলও করে।

হযরত উমার (রা.) তখনও ইসলাম কবুল করেননি; বরং ইসলাম

বিরোধিতাকারীদের মধ্যে তাঁর অবস্থান ছিল অত্যন্ত কঠোর। তিনিও এই ঘটনায় ইতবাচকভাবে প্রভাবিত হন। তাঁর এক নিকট আত্মীয়া হযরত লাইলা বিনতে হামছা বর্ণনা করেছেন, 'আমি হিযরতের জন্য মালামাল প্রস্তুত করছিলাশ। আমার স্বামী এ সময় বাইরে ছিলেন।

ইত্যবসরে হযরত উমার (রা.) আসলেন এবং আমার প্রস্তুতি নিতে দেখতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন আব্দুল্লাহর মা- সত্যি তোমরা চলে যাচ্ছ'? আমি বললাম হ্যাঁ, যাচ্ছি। আল্লাহর কসম, তোমরা আমাদের উপর সাংঘাতিক নিপীড়ন চালিয়েছ। আল্লাহর প্রশস্ত জমিন পড়ে আছে আমরা এমন জায়গায় যেতে চাই, যেখানে আল্লাহ আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন। একথা শোনামাত্র হযরত (রা.)-এর চেহারায় এমন নমনীয়ভাব ফুটে উঠেছিল যা কোন দিনও আমি দেখেনি। এরপর এ কথা বলে বেরিয়ে গেলেন, 'যাও আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন।'

হাবশাতে হিযরতের এ ঘটনার পর কুরাইশ নেতৃবৃন্দ বৈঠকে বসে এ সিদ্ধান্ত নিলো যে, তারা আবু জাহেলের ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে রাবিয়া এবং আমর ইবনুল আসকে হাবশায় পাঠাবে। তাদের দু'জনকে প্রচুর উপঢৌকনসহ পাঠানো হয়। যাতে করে তারা হাবশার বাদশাকে রাজি করিয়ে ঐ সকল মুহাজিরদেরকে মক্কায় ফিরিয়ে আনতে পারে। এই হিযরতে উম্মুল মু'মিনিন হযরত উম্মে সালমা (রা.)ও শরীক ছিলেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে রাবিয়া এবং আমর ইবনুল আসের এ কুটনৈতিক মিশনের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, 'কুরাইশদের এ দু'জন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ দূত হিসেবে আমাদের পিছে পিছে হাবশায় পৌঁছে। প্রথমে তারা নাজ্জাশী বাদশার সভাসদদের মধ্যে ব্যাপক উপহার সামগ্রী বিতরণ করে তাদের মন জয় করে নেয় এবং মুহাজিরদের ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে বাদশাকে রাজি করানোর দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। যথারিতি তারা বাদশাহ নাজ্জাশীর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং মূল্যবান উপহার সামগ্রী তার সমীপে পেশ করেন এবং তারা এ অভিযোগও করেন যে, আমাদের শহরের কিছু অজ্ঞ, অর্বাচীন ছেলে

ছোকরা আপনার এখানে পালিয়ে এসেছে।

আমাদের গোত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এদেরকে ফেরত নেওয়ার জন্য আমাদেরকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। এই লোকেরা আমাদের দ্বীন ত্যাগ করেছে এবং তারা আপনার দ্বীনেও প্রবেশ করেনি। বরং তারা এক অদ্ভুত দ্বীন আবিষ্কার করেছে।' তাদের কথা শেষ না হতেই সভাসদগণ বলতে শুরু করলো, 'এমন লোকদেরকে অবশ্য অবশ্যই ফেরত পাঠানো উচিৎ। তাদের গোত্রের লোকেরা ভালো জানে তাদের মধ্যে কি সব দোষ-ত্রুটি আছে। এদের আশ্রয় দেয়া ঠিক হবে না।

কিন্তু নাজ্জাশী রাগতঃস্বরে বললেন, 'এভাবে তো আমি তাদেরকে ফেরত পাঠাতে পারি না।যারা অন্য দেশের প্রতি আস্থা না এনে আমার দেশের প্রতি আস্থাশীল হয়ে এখানে এসে আশ্যয় নিয়েছে আমি তাদের এ আস্থাকে অবমূল্যায়ন করতে পারি না। আমি তাদেরকে ডেকে এনে ব্যাপারটি যাচাই করে দেখবো। এরা তাদের সম্পর্কে যা কিছু বলছে, তা কতটুকু যথার্থ ও সত্য। সুতরাং বাদশাহ নাজ্জাশী রাসূল (সা.)-এর সাথীদেরকে তার দরবারে ডেকে পাঠালেন।

বাদশা নাজ্জাশীর পক্ষ থেকে পয়গাম পাওয়ার পর রাসূল (সা.)-এর মুহাজের সাহাবীগণ একত্রিত হয়ে পরামর্শ করলেন এবং বাদাশার দরবারে তারা কি বক্তব্য রাখবেন সবাই মিলে ঐক্যমতের ভিত্তিতে তা ঠিকলেন। তারা সিদ্ধান্ত নিলেন আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাদেরকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেনকোন ধরনের রাখঢাক না করে তা হুবহু উপস্থাপন করবেন। তাতে বাদশাহ নাজ্জাশী আমাদেরকে এখানে রাখলে রাখবে, না হয় বের করে দেবে।

বাদশাহ নাজ্জাশীর দরবারে পৌঁছাতেই তিনি প্রশ্ন করে বসলেন, তোরা এটা কি করছ তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের দ্বীন ছেড়ে দিয়েছ আবার আমার দ্বীনেও প্রবেশ করো নাই? না অন্য কোন দ্বীন তোমরা কবুল করেছ? এর জবাবে

মুহাজেরদের পক্ষ থেকে হযরত জাফর ইবনে আবি তালেব (রা.) জোরালো একটি ব[৩]ব্য দিলেন, যার মাধ্যমে তিনি জাহেলিয়াতের নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধ:পতনের চিত্র তুলে ধরলেন।

এরপর রাসূল (সা.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তি ও তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা দিক্ষার উপর আলোকপাত করলেন। সেই সাথে রাসূল (সা.)-এর অনুসারীদের উপর কুরাইশদের জুলুম অত্যাচারের বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরলেন এবং এই বলে বক্তব্য শেষ করলেন যে, আমরা অন্য কোন দেশে না গিয়ে আপনার এখানে এসেছি এই আশায় যে, এখানে আমাদের উপর কোন জুলুম করা হবে না।

হযরত জাফর ইবনে আবি তালেবের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর বাদশাহ নাজ্জাশী বললেন, 'আমাকে ঐ বাণী থেকে কিছু শোনাও যেটা সম্পর্কে তোমরা বলে থাক যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নবীর উপর নাযিল হয়েছে। এর প্রতিউত্তরে হযরত জাফর (রা.) সূরায়ে মারিয়াম থেকে প্রাথমিক অংশ তেলাওয়াত করে শোনালেন যাতে যরত ইয়াহিয় ও হযরত ঈসা (আ.)-এর কথা উল্লেখ ছিল। নাজ্জাশী এটা শুছিলেন এবং কাঁদছিলেন এমনকি চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে গিয়েছিল। হযরত জাফরের তেলাওয়াত শেষ না হতেই তিনি বললেন, 'সন্দেহ নেই এই কালাম আর যা কিছু ঈসা (আ.)-এর উপর নাযিল হয়েছিল একই উৎস থেকে উৎসারিত। আল্লাহর কসম, আমি তোমাদেরকে ওদের কাছে ছেড়ে দেব না।'

দ্বিতীয় দিন আবার আমর ইবনুল আস বাদশা নাজ্জাশীকে বললো, ওদেরকে ডেকে একটু জিজ্ঞেস করুন ঈসা (আ.) সম্পর্কে ওদের ধারণা কি? তারা কিন্তু এ সম্পর্কে ভিন্নধর্মী মারাত্মক কথা বলে থাকে। নাজ্জাশী আবার মুহাজেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা আমর ইবনুল আসের এই কুটনৈতিক চাল সম্পর্কে ইতোমধ্যে আঁচ করতে পেরেছিলেন। এ ব্যাপারে তারা আগের মতই পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত

নিলেন যে, এ ক্ষেত্রে তারা কোন রাখঢাক না করে আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূল (সা.)-এর শিক্ষাকে বিনাদ্বিধায় অকপটে তুলে ধরবেন।

তারা যখন পূনরায় নাজ্জাশীর দরবারে গেলেন এবং আমর ইবনুল আসের পেশকৃত প্রশ্নটি বাদশাহ তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত জাফর (রা.) সাথে সাথে দাড়িয়ে বিনাদ্বিধায় ঘোষণা করলেন, 'ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল এবং তাঁরই পক্ষ থেকে একটি রূহ এবং একটি বাণী। যা কুমারী মারিয়াম (আ.)-কে প্রদান করেছেন।'নাজ্জাশী এ কথা শোনা মাত্রই হাতে একটি তৃণখন্ড নিলেন এবং ঘোষণা করলেন, 'খোদার কসম! তুমি ঈসা (আ.) সম্পর্কে যা কিছু বলেছ তিনি তা থেকে এই তৃণখন্ড তুল্যও অতিরিক্ত কিছু নন। এরপর বাদশাহ নাজ্জাশী কুরাইশদের পাঠানো সকল উপহার উপঢৌকন ফেরত দিয়ে বললেন, তোমরা এখানে পরিপূর্ণ প্রশান্তির সাথে থেকে যাও।'

## সামাজিক বয়কট ও শিবে আবু তালেবে বন্দি জীবন

কুরাইশ সরদাররা রাসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে নিত্য-নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে থাকে। কিন্তু, একে একে তাদের সকল ফন্দি ফিকেরের ব্যর্থতা ও ইসলামে ক্রমাগত অগ্রগতি এবং বড় বড় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ইসলাম গ্রহণের দৃশ্য দেখে ইসলামের শত্রুরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। বিশেষ করে অল্প সময়ের মধ্যেই কুরাইশ সরদাররা বড় ধরনের চারটি ধাক্কা খায়। তা হলো-

(১) হযরত হামজা (রা.) -এর ইসলাম গ্রহণ

(২) হযরত উমার (রা.)-এর ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ

(৩) বনু হাশেম গোত্র রাসূল (সা.)-এর পাশে এসে দাড়ানো

(৪) বনু মোত্তালিব গোত্র রাসূল (সা.)-কে রক্ষার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

এতে মক্কার কাফেররা অস্থির হয়ে উঠে। নবুওয়াতের সপ্তম বছরের মুহার্‌রম

মাসে মক্কার সব গোত্র একত্রিত হয়ে এ মর্মে চুক্তি সম্পাদন করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করার জন্য তাদের হাতে সমার্পণ না করা হবে, ততক্ষণ কেউ বনু হাশেমের সংস্পর্শে যাবে না, কেউ তাদের সাথে বেচাকেনা করবে না, কেউ তাদের সাথে দেখা সাক্ষাত করবে না এবং কেউ তাদেরকে খানা-পিনা সরবরাহ করবে না। এ চুক্তি লিখে তারা ক'বার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে।

রাসূল (সা.) নিজ গোত্রের লোকজনসহ শি'আবে আবু তালেবে বন্দী হয়ে পড়েন। দীর্ঘ তিন বছর এ গিরি গুহায় রাসূল (সা.) ও তাঁর গোত্রের লোকদেরকে অশেষ দুর্গতিতে জীবন কাটাতে হয়। এ সময় কখনো কখনো তাদের গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারন করতে হতো। এমনকি ক্ষুধার জ্বালায় শুকনো চামড়া পর্যন্ত তাঁদেরকে সিদ্ধ করে খেতে হতো। অবস্থা এতদূর গড়ায় যে, বনু হাশেম গোত্রের নিষ্পাপ শিশুরা যখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় চিৎকার করে কাঁদতো তখন অনেক দূর থেকে তাদের মর্মভেদী শব্দ শোনা যেত। তখন জালিমরা তা শুনে পৈশাচিক আনন্দ অনুভব করতো।

কখনো কোন হৃদয়বান ব্যক্তির মনে করুণার উদয় হলে তারা লুকিয়ে কিছু খাবার পাঠিয়ে দিত। অবশেষে হৃদয়বান কিছু লোক এ জুলুমের অবসানে এগিয়ে আসেন। তাদের মধ্যে হিশাম ইবনে আমর সর্বপ্রথম এ নিপিড়নমূলক চুক্তি বাতিলের উদ্যেগ গ্রহণ করেন এবং আরো কিছু লোককে নিয়ে তাদের তিন বছরের বন্দী দশার অবসান ঘটান।

## দু:খ বেদনার অতি কষ্টের বছর

নবুওয়াতের দশম বছরে শি'আবে আবু তালেবের বন্দী দশা থেকে বেরিয়ে এসেছেন এবং কুরাইশদের জুলুম নির্যাতন থেকে সাময়িকভাবে কিছুটা হলেও মুক্তি পেয়েছেন। এর মাত্র কয়েক দিন পরই চাচা আবু তালেব মৃত্যুমুখে পতিত হন। এর কিছু দিন পর হযরত খাদিজা (রা.)ও পরলোক গমন করেন। এ

বছরটিকে রাসূল (সা.) 'শোকের বছর' বলে চিহ্নিত করেন। এ দু'ই ব্যক্তিত্বের তিরোধানে কুরাইশদের বিরোধীতা আরো বেড়ে যায়। ইবনে ইসহাক বলেন, এ সময় এতো বেশি নির্যাতন চালানো হয় য আবু তালেবের জীবদ্দশায় কেউ সাহাস করেনি।'

## তায়েফবাসীদের নিকট ইসলামের দাওয়াত

মক্কাবাসীদের মধ্যে যারা ভালো লোক ছিলো তারা ক্রমান্বয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ জন্য রাসূল (সা.) এবার মক্কার বাইরে ইসলাম প্রচার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে মোতাবেক নবুওয়াতের দশম বছরে তিনি সর্বপ্রথম তায়েফ গমন করেন। তায়েফে ছিলো বড় বড় বিত্তবান ও প্রভাবশালী লোকদের বসবাস। মক্কার পর পরই দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিলো তায়েফ। রাসূল (সা.) তাঁর গোলাম জায়েদ ইবনে হারেসাকে সাথে নিয়ে তায়েফে বনু ছাকিফ গোত্রের সবচেয় গণ্যমান্য বিত্তবান তিন ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হলেন। তারা ছিলেন তিন ভাই আবদ ইয়ালীল, মাসউদ ও হাবীব। তাদের পিতার নাম আমর ইবনে উমাইর। তাদের একজন কুরাইশ গোত্রের বনু জুমাহ উপগোত্রের বংশের মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। তাদের নিকট বসে রাসূল (সা.) তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন এবং ইসলাম প্রচারে সহায়তা করার জন্য অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তারা আল্লাহর রাসূলের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেন। তাদেরকে পরকালের পরিণতির ভয় দেখানো হলে তারা অহংকার প্রদর্শন করেন। রাসূল (সা.)-এর কথার কোন গুরুত্বই তারা দিলেন না।

তায়েফের নেতৃত্ব স্থানীয় লোকেরা রাসূল (সা.)-কে মিথ্যাবাদী বলে তাড়িয়ে দেওয়ার এক ঘৃণ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তারা তাঁকে গালিগালাজ করে। তারা তাদের গোত্রের মুর্খ, নির্বোধ ও বখাটে ছেলেদেরকে তাঁর পিছনে লেলিয়ে দিলে তারা তাঁকে মেরে রক্তাক্ত করে ফেলে। বাধ্য হয়ে তায়েফের বাইরে উতবা ও শাইবা ইবনে রাবীয়া নামক দুই ভাইয়ের দেয়াল ঘেরা একটি ফলের বাগানে গিয়ে আল্লাহর রাসূল (সা.) আশ্রয় নিলেন। রাসূল (সা.) একটি আঙ্গুর ঝোপের

ছায়ায় গিয়ে বসলেন। এ সময় রাসূল (সা.)-এর কুরাইশ উপ-গোত্রের ঐ মহিলার সাক্ষাত ঘটে। তিনি মহিলাটিকে বললেন, 'তোমার দেবররা আমার সাথে কি আচরণ করলো দেখলে তো? উতবা ও শায়বা বিন রাবিয়া ইতোমধ্যে তাদের এক ঈসায়ী গোলাম আদ্দাসের মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এর জন্য একটি বড় পাত্রে করে কয়েক গোছা আংগুর পাঠলো এবং তা মুহাম্মদ (সা.)-কে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে বললো। আদ্দাস আঙগুরের পাত্রটি নিয়ে রাসূল (সা.)-এর সামনে রাখলেন এবং বললেন, খান। রাসূল (সা.) 'বিসমিল্লাহ বলে কাওয়া শুরু করলেন। অত:পর একটু শান্ত হয়ে রাসূল (সা.) তায়েফবাসীর জন্য হেদায়েতের দো'য়া করে মক্কায় ফিরে আসেন।

এ ঘটনাটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। 'হযরত আয়েশা (রা.) একদা জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! উহুদের দিনের চেয়ে মারাত্মক কোন দিন আপনার জীবনে এসেছিলো কি? রাসূল (সা.) বললেন, 'তোমার কওম থেকে আমি যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ দিন ছিলো তায়েফের দিন। ঘটনা এতো সীমালংঘনমূলক ছিলো যে জিব্রাইল দুই পাহাড়ের ফিরেশতা নিয়ে উপস্থিত হন। আমার সম্মতি পেলে তারা তায়েফবাসীকে দু'দিকের পাহাড় দিয়ে পিষে মেরে ফেলতো। কিন্তু রাসূল (সা.) তা না করে রবের দরবারে ফরিয়াদ করলেন, 'হে রব! আমার সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করো, তারা তো আমার মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে জানে না।'

এ বছরে গোত্রে গোত্রে দাওয়াত দেওয়ার পাশাপাশি প্রভাবশালী ও নেতৃস্থানীয় আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের নিকট চিঠি পত্র ও দূত প্রেরণ করে দাওয়াত প্রদান করেন। হজ্জের মৌসুমে হাজীদের তাবুতে গিয়ে দাওয়াতের কাজ করেন। এতে করে মক্কার বাইরে বিভিন্ন গোত্রে দ্রুতবেগে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যায়। এ বছরেই একজন মদিনাবাসী আয়াস বিন মুয়াজ ইসলাম গ্রহণ করেন।

**মি'রাজের ঘটনা**

তায়েফ ও হিযরতের ঘটনার মাঝখানে মি'রাজের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্য মন্ডিত আর কোন ঘটনা ঘটেনি। তায়েফের অভিজ্ঞতা এতই মর্মান্তিক ছিলো যে তা অতিক্রম করতে গিয়ে রাসূল (সা.) দু:খ বেদনার শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। তায়েফের এ অভিজ্ঞতার পর রাসূল (সা.) যেন জীবনের সর্বশেষ পরীক্ষা অতিক্রম করলেন। আল্লাহর বিধান অনুসারেই এখন নতুন যুগের সূচনা অবধারিত ছিলো। বিজয় যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছিলো।

এরই সুসংবাদ দেয়ার উদ্দেশ্যে, কষ্ট লাঘব করার জন্যে এবং যে সত্যের ব্যাপারে প্রতিটি মানুষকে এতো দিন আহবান জানিয়েছিলেন তা স্বচক্ষে দেখার প্রয়োজনে তাঁকে মি'রাজ দ্বারা সম্মানিত করা হয়। তাঁকে রাতারাতি গায়েবী শক্তি যোগে মসজিদে হারামে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে মসজিদে আকসায় পৌঁছানো হয়। এরপর এর পার্শ্ববর্তী এলাকা, সপ্তআসমান ভ্রমণ, জান্নাত জাহান্নামসহ আল্লাহর নির্দেশনাবলী পর্যবেক্ষণ এবং আম্বিয়া (আ.)-দের সাথে সাক্ষাৎ এর ঘটনা সংঘটিত হয়। এরপর রাসূল (সা.)-কে সপ্তআকাশের উপরে 'সিদরাতুল মুনতাহায়' নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি আল্লাহ তা'য়ালার এতো কাছাকাছি † পাঁছেন যে উভয়ের মধ্যে দুইটি ধনুক বা তারও চেয়ে ব্যবধান ছিলো।

**আকাবার প্রথম শপথ**

নবুওয়াতের একাদশ বছরে হজ্জের মৌসুমে রাতের বেলা রাসূল (সা.), হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত আলী (রা.)-কে সাথে নিয়ে প্রায় রাতে বের হতেন এবং হাজীদের তাবুতে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। এ রকমই এক রাতে বনু যোহাল এবং বনু শায়বান ইবনে ছালাবা গোত্রে গেলেন এবং তাদের কয়েকজনকে একত্র করে দাওয়াত দেন। ফেরার পথে মিনার পাহাড়ী এলাকা অতিক্রমের সময় সেখানে কয়েকজন লোককে আলাপ করতে দেখলেন। এরা বয়সে যুবক মদিনার খাজরাজ গোত্রের লোক। হজ্জ করতে এসেছেন। রাসূল (সা.) তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। উপস্থিত ছয়জনই

ইসলাম কবুল করে মুসলমান হয়ে গেলেন এবং তারা মদিনায় গিয়ে তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করবেন বলে রাসূল (সা.)-এর নিকট শপথ গ্রহণ করেন। মদিনায় গিয়ে তারা তাদের কৃত শপথ পূরণ করেন এবং মদিনার ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেন।

## আকাবার দ্বিতীয় শপথ

নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে বারোজন ব্যক্তির একটি দল মদিনা থেকে এসে রাসূল (সা.)-এর সাথে সাক্ষাত করেন যাতে পূর্বে ছয়জনও ছিলো। তারা মিনার নিকটবর্তী আকাবা নামক স্থানে রাসূল (সা.)-এর হাতে শপথ নেন যে, 'আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবো না, চুরি করবো না, ব্যভিচার করবো না, সন্তান হত্যা করবো না, জেনে শুনে কারোর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাবো না এবং কোন সৎ কাজে মুহাম্মদ (সা.)-এর অবাধ্য হবো না।' এ দলটির সাথে মদিনার লোকদের দাওয়াত ও প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষক হিসেবে মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-কে পাঠিয়ে দেন। হযরত মুসআবসহ আকাবায় শপথকৃত সাহাবাগণের জোর তৎপরতায় মদিনার চেহারা পাল্টে গেল।

## আকাবার তৃতীয় শপথ

নবুওয়াতে ত্রয়োদশ বছরে হজ্জের মৌসুমে মদিনা থেকে ৭২ জন পুরুষ এবং দু'ই জন মহিলা যারা পূর্বেই মুসলমান হয়েছিলো তারা মক্কায় এসে আল্লাহর রাসূলের সাথে সাক্ষাত করেন। ইবনে ইসহাক বলেছেন, ৭৩ জন পুরুষ তার মধ্যে ১১ জন আউস গোত্রের এবং ৬২ জন ছিলেন খাজরাজ গোত্রে এবং তাদের সাথে দুই জন মহিলাও ছিলেন। তাদের একজন নুসাইবা বিনতে কা'ব এবং দ্বিতীয় জন ছিলেন আসমা বিনতে আমর।

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমরা রাসূল (সা.)-এর সঙ্গে যুদ্ধের অঙ্গিকারে আবদ্ধ হলাম। সেই অঙ্গিকারের শর্তাবলী ছিলো এই, অবস্থা

কঠিন কিংবা স্বাভাবিক যা হোক না কেন এবং স্বেচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক নেতার আনুগত্য করবো ও নির্দেশ মেনে চলবো। আমরা আমাদের মুহাজির মুসলিম ভাইকে সব বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করবো। দায়িত্বশীল নেতার সাথে তাঁর কর্তৃত্বাধীন বিষয়ে কলহ করবো না। যেখানেই থাকি না কেন আমরা সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কথা বলবো এবং আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পওরায়া করবো না।' এরপর রাসূল (সা.) নিজের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, তোমাদের কাছে যাওয়ার পর আমাকে তোমরা সাহায্য করবে এবং নিজেদের প্রাণ ও সন্তানদের হেফাজতের মতোই আমার হেফাজত করবে। তাহলে তোমাদের জন্য জান্নাত রয়েছে।'[সহীহ মুসলিম]

## মক্কা থেকে মদিনায় হিযরত

মদিনায় হিযরতের মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এর ঘটনাবহুল মক্কার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তিনি অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম করে বিজয়ের যুগে উপনীত হন। আর এই হিযরতই হলো রাসূল (সা.)-এর মাদানী জীবনের সূচনাপর্ব। নবুওয়াতের তেরতম বছরে রাসূল (সা.) মুসলমানদেরকে মদিনায় হিযরত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। ফলে পর্যায়ক্রমে মুসলমানগণ মক্কা থেকে মদিনায় যাওয়া শুরু করে। অপরদিকে মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদের হিযরত থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে থাকে।

এ প্রসংগে রাসূল (সা.) মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য ভাই জোগাড় করে দিয়েছেন এবং এমন একটি নগরী ঠিক করে দিয়েছেন যেখানে তোমরা নিরাপদে থাকতে পারবে।' অপরদিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ না আসা পর্যন্ত রাসূল (সা.) অন্যদের মদিনায় হিযরতের নির্দেশ দিলেও তিনি মক্কায় থেকে যান এবং শেষ সময় পর্যন্ত অবস্থান করেন। এ সময় পর্যন্ত অন্যদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত হামজা (রা.) এবং হাবশা থেকে ফিরে আসা সাতজন যাদেরকে কুরাইশরা বন্দী করে রাখে এবং যারা

হিযরত করতে গিয়ে ধরা পড়েন অথবা যাদের পক্ষে হিযরত করা সম্ভব ছিল না তারা মক্কায় থেকে যান। বাদবাকী আর সবাই মক্কা থেকে মদিনায় চলে যান। এরই মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) হিযরতে রাসূল (সা.)-এর সফর সঙ্গী হবার আশ্বাস পেয়ে অত্যন্ত আশান্বিত হন।

হযরত আলী (রা.)-কে রাসূল (সা.) একটি বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য মক্কায় রেখে দেন। যে বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য হযরত আলী (রা.)-কে বাছাই করেন সেটি মানবিক দায়িত্ববোধের ক্ষেত্রে বিশ্বের বিরলতম দৃষ্টান্ত। যার নুন্যতম দৃষ্টান্ত মানব ইতিহাসে কোথাও খুজে পাওয়া যাবে না। তাহলো মক্কার যেসব লোক তাদের মূল্যবান ধন-সম্পদ সংরক্ষণে ভয় পেত বা চুরি ডাকাতি হয়ে যাবার আশংকা করতো, তারা তা রাসূল (সা.)-এর নিকট আমানত হিসেবে জমা রাখতো। কট্টরভাবে যারা রাসূল (সা.)-এর বিরোধীতা করত, তারাও রাসূল (সা.)-এর উপর আস্থা পোষণ করে দ্বিধাহীন চিত্তে মূল্যবান সম্পদ আমানত রাখত।

রাসূল (সা.) তাদের দ্বারা চরমভাবে নির্যাতনের শিকার হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের প্রিয় জন্মভূমি, কা'বা বাইতুল্লাহর ভূমি, মসজিদুল হারামের ভূমি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু জানের এ ধরনের শত্রুদের আমানত তাদের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব পালনে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি। সকলের আমানত যথাযথভাবে তাদের কাছে পৌঁছানোর এক কঠিন ও গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি চরম ঝুকি থাকা সত্ত্বেও হযরত আলী (রা.)-কে মক্কায় রেখে যান।

এসব কিছুর মধ্য দিয়ে রাসূল (সা.)-এর অতুলনীয় মানবিক দায়িত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। আপরদিকে মাত্র ২২/২৩ বছরের যুবক হযরত আলী (রা.) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর জন্য কত নিবেদিত প্রাণ ছিলেন, মানবরূপী হায়নাদের হিংস্র আক্রমণের মুখে কত নির্ভিক ছিলেন তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল।

এদিকে রাসূল (সা.) যাতে মক্কা ছেড়ে মদিনায় যেতে না পারে এ ব্যাপারে আবু জাহেলের নেতৃত্বে পরামর্শ গৃহ 'দারুননাদওয়াতে' কুরাইশ নেতৃবৃন্দ বৈঠকে সমবেত হয়। এটি ছিলো কুসাই ইবনে কিলাবের বাড়ি। কুরাইশরা যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে এখানেই সমবেত হতো। মক্কার করাইশদের গোত্রপতিরাসহ প্রভাশালী প্রায় সকলেই উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলো। তারা সকলেই মিলে সিদ্ধান্ত নিলো মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করা হবে। কেননা এ ছাড়া আর কোন কৌশল ঝুকিমুক্ত নয়।

রাসূল (সা.)-কে হত্যা করার এ জঘন্য প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর হযরত জিব্রাইল (আ.) ওহী নিয়ে রাসূল (সা.)-এর নিকট হাজির হন। তিনি রনাসূল (সা.)-কে কুরাইশদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করে বলেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে মক্কা থেকে হিযরত করার অনুমতি দিয়েছেন। হিযরত করার সময় জানিয়ে জিব্রাইল (আ.) রাসূল (সা.)-কে বললেন, আপনি আজ রাতে আপনার বাসভভনের বিছানায় শয়ন করবেন না।' [যায়াদুল মা'য়াদ, ২য় খন্ড] এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ মোতাবেক রাসূল (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে সাথে নিয়ে নবুওয়াতের তেরতম বছরে সফর মাসের ২৬/২৭ তারিখ মোতাবেক ৬২২ খ্রিঃ ৫৩ বছর বয়সে প্রিয় জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদিনার পথে হিযরতের সূচনা করেন।

হযরত আলী (রা.)-কে কিছু দায়িত্ব দিয়ে নিজ ঘরের বিছানায় শুইয়ে রেখে গভীর রাতে তাঁকে হত্যার নিমিত্ত স্বীয় বাসভবন ঘেরাওকারীদের সামনে দিয়েই বেরিয়ে গেলেন এবং মক্কা থেকে ১৩/১৪ মাইল দূরে 'সওর' পর্বতের গুহায় অবস্থান নিয়েছিলেন। এ গুহাতে রাসূল (সা.) তিন দিন অবস্থা করেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, 'আমরা রওনা হওয়ার পর কওমের লোকেরা আমাদের খোঁজ করছিল। কিন্তু ছোরাকা ইবনে মালিক ইবনে জুশুম ছাড়া কেউ আমাদের দেখতে পায়নি। ছোরাকা ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল। আমি বললাম হে

আল্লাহর রাসূল (সা.) একটি লোক আমাদের পিছু লেগেছে, সে কাছাকাছি এসে পড়েছে। প্রিয় নবী (সা.) সাথে সাথে বললেন, লা তাহজান ইন্নাল্লাহা মাআনা।' অর্থাৎ ভয় পেয়ো না আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছে।'।

এরপর ১ লা রবিউল আউয়াল সোমবার 'সওর' পর্বতের গুহা থেকে বের হয়ে মদিনার দিকে যাত্রা শুরু করেন। মদিনায় পৌঁছানোর পর রাসূল (সা.)-কে মদিনার সকল স্তরের নারী, পুরুষ ও শিশুরা বরণ করে নিয়ে ছিলেন। রাসূলের অভ্যর্থনার জন্য মদিনায় সেদিন জনতার ঢল নেমেছিল। এটি ছিল এক ঐতিহাসিক দিন। মদিনাবাসী এ ধরনের দৃশ্য অতীতে কখনো দেখেনি।

হযরত আলী (রা.) তিন দিন মক্কায় অবস্থান করে মানুষের আমানতসমুহ বুঝিয়ে দিয়ে মদীনায় আসেন। অপরদিকে হযরত হামজা (রা.) রাসূল (সা.)-এর পরে মক্কা থেকে মদিনায় পৌঁছেন। কেননা রাসূল (সা.)-এর নিরাপদে মক্কা ত্যাগের ব্যাপারটি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি মক্কা ছেড়ে মদিনায় যেতে চাননি।

## কোবায় অবস্থান

৬২২ খ্রিঃ সোমবারের দিন রাসূল (সা.) কোবায় অবতরণ করেন। এখানে রাসূল চারদিন অবস্থান করেন। এ সময় তিনি মসজিদে কোবার ভিত্তি স্থাপন করেন এবং সেই মসজিদে নামাজ আদায় করেন। নবুয়াত প্রাপ্তির পর এটি ছিলো প্রথম মসজিদ। তাকওয়ার উপর এই মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। পঞ্চম দিন তিনি সকলকে সাথে নিয়ে মদিনার পথে রওনা হলেন। বনু সালেম ইবনে আওফেরজনপদে পৌঁছার পর জুমআর নামাজের সময় হলো। রাসূল (সা.) এ লোকালয়ে জুমআর নামাজ আদায় করলেন। বর্তমান সেখানে একটি মসজিদ বর্তমান রয়েছে।

## মদিনায় প্রবেশ

জুমআর নামাজের পর রাসূর (সা.) মদিনায় গমন করেন। সেদিন থেকে ইয়াসরিবের নাম হয়েছে 'মদিনাতুর রাসূল'। সংক্ষেপে মদিনা। মদিনার

আনসাররা ধনী বা বিত্তশালী ছিলেন না। কিন্তু, সবাই চাচ্ছিলেন যে, রাসূল (সা.) তার বাড়িতে অবস্থান করবেন। যে এলাকা দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেনসেখানকার লোকেরাই প্রিয় নবী (সা.)-এর উটের রশি ধরে তার বাড়িতে আসার আবেদন জানাতেন। কিন্তু রাসূল (সা.) বলে দিলেন যে, উটনির পথ ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর তরফ থেকে আদেশ পেয়েছে। এরপর উটনি ইচ্ছামত চলতে লাগলো এবং বর্তমান যেখানে মসজিদে নববী রয়েছে সেখানে গিয়ে থামলো। রাসূল (সা.) উট থেকে নামলেন না। এরপর উট সামনের দিকে কিছুদূর এগিয়ে গেল এরপর পুনরায় ঘুরে আগের জায়গায় ফিরে এলা এবং বসে পড়লো। এটা ছিল রাষূল (সা.)-এর নানাদের মহল্লা অর্থাৎ বনু নাজ্জারদের মহল্লা।

উটকে আল্লাহর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়ায় সে বনু নাজ্জার এলাকায় থেমে নানাদের প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। রাসূল (সা.) মনে মনে এটাই চাচ্ছিলেন। এবার বনু নাজ্জার গোত্রের লোকেরা প্রত্যেকে নিজ নজি বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার আবেদন, নিবেদন জানালেন। কিন্তু আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) এগিয়ে এসে উটের লাগাম ধরলেন এবং তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস (রা.) থেকে একটি বর্ণনা আছে যে, প্রিয় নবী (সা.) বললেন, আমাদের মধ্যে কার ঘর সবচেয়ে কাছে? হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) বললেন, আমার ঘর হে আল্লাহর রাসূল। এই হচ্ছে আমার ঘর, আর এই হচ্ছে আমার দরজা। রাসূল (সা.) বললেন, আপনার উভয় আসুন, আল্লাহ পাক বরকত দেবেন।' হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, প্রিয় রাসূল (সা.) মদিনায় আসার পর হযরত আবু (রা,) এবং হযরত বিলাল (রা.) জ্বরে আক্রান্ত হলেন। এ খবর হযরত আয়েশা (রা.) প্রিয় রাসূলের কাছে গিয়ে দিলেন।

রাসূল (সা.) বললেন, হে আল্লাহ! মক্কা যেমন আমাদের নিকট প্রিয় ছিল, মদিনাকেও তেমন প্রিয় করে দাও। বরঞ্চ তার চেয়ে বেশি মদিনার পরিবেশ ও আবহাওয়া স্বস্থ্যকন করে দাও। এখানে শস্যের মধ্যে বরকত দাও। এখান থেকে

অসুখ জাহফায় সরিয়ে নাও।' আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন রাসূলে দো'য়া কবুল করলেন, পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়ে গেল। এ পর্যন্ত রাসূল (সা.)-এর জীবনের এক অংশ এবং ইসলামী দাওয়াতের মাক্কী যুগ পূর্ণ হলো।

## নোট